# পূর্ব রণাঙ্গনঃ ভারতের বাংলাদেশ সমস্যা

চয়নিকা সাক্সেনা

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

আগস্ট মাসের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরবর্তী সময়ে, যে সামাজিক-রাজনৈতিক উত্তাল অবস্থার পরিণাম নিয়ে বাংলাদেশ এখনও লড়ে চলেছে, যার ফলশ্রুতি, ব্যাপক সংগঠিত গণ-প্রতিবাদের কারণে, পনের বছর ক্ষমতায় থাকার পর শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে পলায়ন করেছেন, তার প্রভাব সীমান্ত পেরিয়ে ভারতেও অনুভূত হচ্ছে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারকে মিত্র হিসেবে হারান থেকে শুরু করে বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ঘটা তথাকথিত নৃশংসতার সাক্ষী থাকা পর্যন্ত নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ভারতকে, যেগুলির আশু ও সহজ সমাধান সম্ভব নয়। এই অবস্থায়, বাংলাদেশের জন্য ভারতের দ্বারা গৃহীত দ্বিমূল (বাইনারি) পন্থাটির পুনর্বিবেচনা করা দিল্লির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর অর্থ হল, নতুন দিল্লির উচিত আওয়ামী লীগ বনাম অন্যরা – এই পন্থাটিকে বদলে দ্রুতক্রিয় এবং বহুমুখী ও বহুমাত্রিক (মাল্টি-ভেক্টর) পররাষ্ট্র নীতির পরিসর নির্মাণ করা।

**অতিরেকের প্রভাব**

বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ যখন পরিকাঠামোগত সংস্কার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যস্ত, প্রতিবেশী দেশের এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের ফলে ভারতের পক্ষে যে ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার মত কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ কাজের দায়িত্ব ভারতের উপর এসে পড়েছে।

আগস্ট মাসের ৫ তারিখ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের গদিচ্যুতি যে এত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে, তার কারণ ছিল বাংলাদেশের কোটা বা সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে পুনর্বহাল করার বিরুদ্ধে দেশজোড়া ছাত্র আন্দোলন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য যাঁরা লড়েছিলেন, বাংলাদেশের সেই মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের জন্য সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ সংরক্ষিত রাখাই এই কোটা প্রক্রিয়া। যাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, তাঁদের মতে, আওয়ামী লীগের সদস্য বা তাঁদের ঘনিষ্ঠ জনকেই একমাত্র এই নিয়মটির সুবিধা দেওয়া হয় এবং একমাত্র তাঁদের প্রতিই যাবতীয় সাংগঠনিক পক্ষপাত বর্ষিত হয় বলে এই কোটা প্রক্রিয়াটি মূলত বৈষম্যমূলক। জুলাই মাসে এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়টি যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু, সরকারের পক্ষ থেকে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও প্রতিবাদরত ছাত্রছাত্রীদের সুনামহানির উদ্দেশ্যে তাঁদের "রাজাকার" (১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে, দেশদ্রোহী) আখ্যা দেওয়ার মধ্যে হাসিনার যে তথাকথিত সংবেদনশূন্যতা দেখা যায়, তার ফলেই এই ছাত্র আন্দোলন একটি দেশজোড়া বিপ্লবে পরিণত হয়। নিরাপত্তা বাহিনী, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী যখন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করেন, তখন হাসিনা ও তাঁর সরকার দুর্বল ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বাংলাদেশ থেকে পলায়ন করে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়।

জনসমক্ষে ভারত-ঘনিষ্ঠ হাসিনা সরকারের এই পরাজয় ও উৎখাত, বাংলাদেশের পশ্চিমপ্রান্তের প্রতিবেশী দেশেও তরঙ্গ প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে, যেখানে ইদানীং ভারত-বিরোধী মনোভাব দ্রুত বেড়ে চলছে, সেখানে ভারত একটি প্রায় মিত্রশক্তিকে হারাল। সীমান্তের ওপার থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সন্ত্রাসবাদী ও চরমপন্থী তর্জন ও হুমকির মত সরাসরি বিপদগুলির কারণে, ভারত ক্রমাগত তার আদর্শগত ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে এই অঞ্চলে ভারত-চিন বৈরিতার থেকে জাত তীব্রতর কৌশলগত সঙ্কট, যা স্পষ্ট হয় মালদ্বীপ ও নেপালের মত দেশের উদাহরণ থেকে। এই বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের পটভূমিতে, হাসিনা প্রশাসনের অধীনে একটি তুলনামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, আপাতদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক সরকারের গদিচ্যুতি ভারতের তথাকথিত "প্রতিবেশী প্রথম নীতি" নামের এই গহ্বরের উপর সকলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিয়েছে। এর ফলে, ভারতের আঞ্চলিক নীতির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছে।

পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ঢাকা "ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্যের সক্রিয় প্রয়োগকারী" হিসেবেই রয়ে গেছে এবং নতুন দিল্লিকে ইসলামী মৌলবাদ এবং ভারতের সীমান্তের অন্দরে বিদ্রোহ দমন করতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশে নতুন করে নির্বাচন এখনও মুলতুবি রাখা হয়েছে এবং মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপস্থিতি সত্ত্বেও, একটি বিদ্যমান রাজনৈতিক শূন্যতা ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খুব একটা সহানুভূতিশীল নয়, এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা নতুন দিল্লির সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতেই পারে। একই ভাবে, ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগের গদিচ্যুতি ভারতের আঞ্চলিক শত্রু দেশ, অর্থাৎ চিন ও পাকিস্তানের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূচিত্রকে তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছাঁচে ঢেলে সাজানর অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। সন্দেহাতীতভাবে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার উপর ভারতের প্রভাব যে শুধু একটি আদর্শগত ধাক্কাই খায় নি, তার সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীরতর সমস্যারও মুখোমুখি হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের উপর হামলা ও ভাঙচুর এবং ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের সম্পূর্ণ লকডাউনের মত ঘটনাবলী, ২০২১ সালে কাবুল তালিবানের অধিকারে চলে আসার পরবর্তী অবস্থার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

ভূ-অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে, যদি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী ও ভবিষ্যৎ সরকার উভয়েই ভারত বাদে অন্যান্য দেশকেও তাদের অর্থনৈতিক বহুমুখীতায় অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে তা আশ্চর্যজনক কিছু হবে না। এবং তাহলে আমরা নতুন দিল্লির প্রেক্ষিতে দুটি জিনিস ঘটতে দেখব। এর মধ্যে একটি হল আওয়ামী লীগের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার সৌর খামার প্রতিষ্ঠার জন্য চিনের দ্বারস্থ হয়েছে। অন্যটি হল, অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ভারত-বিরোধী মনোভাবের দ্বারা কর্দমাক্ত। উদাহরণ হিসেবে, ভারতীয় পণ্য বর্জনের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)-র আহ্বানের কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক হাঙ্গামা ম্যারিকো, গোদরেজ ও ডাবুর সহ বারটি ফাস্ট-মুভিং কনজ্যুমার গুডস (এফএমসিজি)-এর সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং তাদের স্টকের মূল্য ও আয়কে সংকটে ফেলেছে।

আরও পরিকাঠামোগত স্তরে, শেখ হাসিনার সময়ে ভারতের সঙ্গে যত চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছ, সেগুলি সবই গোপন ও অন্যায্য বলে বাতিল করার দাবি জানিয়েছে বিএনপি। এদিকে আবার ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে এমওইউগুলিকে ঢাকার পক্ষে "অলাভজনক" বলে মনে করছে, সেগুলিকে ছেঁটে ফেলার কথা ভাবছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু, খাদ্য, কার্পাসের সুতো, এবং শক্তির সরবরাহের জন্য ঢাকা যেহেতু নতুন দিল্লির উপর নির্ভরশীল, তাই এই প্রস্তাবটি হয়ত খুব বেশি জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয় না। তবে, বাংলাদেশে ভারতের অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষয়ীভবনই হয়ত নতুন স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হবে। অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার পর স্থলবন্দরের দ্রুত পুনরুদ্ঘাটন ও দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পুনরায় স্বাভাবিকীকরণ

সত্ত্বেও, বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক অশান্তির কারণে আশুগঞ্জ-আখাউড়া ফোর-লেন রাজপথের মত প্রকল্প মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়েছে। দেখার বিষয় হল, কত দ্রুত এই ধরণের প্রকল্প আবার শুরু হয়, বা আদৌ শুরু হয় কিনা। এর অনেকটাই নির্ভর করছে ঢাকায় কে ক্ষমতায় আসছেন এবং ঠিক কখন, তার উপর।

নতুন দিল্লির জন্য পরিকাঠামোগত উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি, ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বাংলাদেশের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। হাসিনা সরকারের মত স্পষ্টতই একটি মোটামুটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের গদিচ্যুতি এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য এবং তাঁদের সম্পত্তি ও সংগঠনের উপর হামলা ও হিংসার ঘটনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্বেগ ও নাগরিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আগস্ট মাসের পাঁচ থেকে দশ তারিখের মধ্যেই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ২০০টির বেশি হিংসার ঘটনার কথা জানা গেছে। ১৫ই আগস্ট তাঁর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায়, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই অবস্থা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সময়, ভারতের স্বার্থান্বেষী কিছু গোষ্ঠী, বিশেষ করে দক্ষিণপন্থী দলগুলি বিভিন্ন দাবির তালিকা নিয়ে আসামের বাংলাদেশ হাই কমিশনে মিছিল করেছে এবং মহারাষ্ট্র আর ত্রিপুরাতে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে। এইভাবে নানা উপায়ে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এই আক্রমণকে তারা নিজেদের কাজে লাগাতে শুরু করেছে। এমনকি, বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে আলোচনা, ভারতের আঞ্চলিক নির্বাচনী কথোপকথনেও প্রবেশ করতে পেরেছে। এর থেকেই স্পষ্ট হয়, এই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণির কল্পনা ঠিক কতটা দখল করেছে প্রতিবেশী দেশের এই সঙ্কটকাল। তথাপি, ভারতের এই প্রতিক্রিয়া যে বাংলাদেশ লক্ষ্য করবে, তা বলাই বাহুল্য। এবং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি পরিশীলিত হবে এই আশা থাকায়, এবং বিশেষ করে যখন নতুন দিল্লির কাছে ঢাকার নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে আরও বিবেচনা সমৃদ্ধ একটি দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে, তখন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ওই দেশের মনোভাব যে আরও প্রতিকূল হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।

**একটি বহুমুখী ও বহুমাত্রিক পন্থা গ্রহণ**

বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র নীতিকে দূরদৃষ্টিহীন ও দ্বিমূল বলে সমালোচনা করা হয়েছে, এবং এক দিক থেকে দেখলে, আওয়ামী লীগের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার জন্য নতুন দিল্লিকে দামও দিতে হচ্ছে বলেই মনে হয়। ঢাকায় সামগ্রিক যে পরিপ্রেক্ষিত দেখা যাচ্ছে, সেখানে ভারত এখন প্রায় মিত্রহীন। নতুন দিল্লিকে যেহেতু এমন এক শক্তি হিসেবে দেখা হয় যে একবার নয়, তিনবার হাসিনার কঠোর শাসন পদ্ধতিকে পোষকতা দিয়েছেছে, তাই বাংলাদেশের সাধারণ মনোভাব ভারতের প্রতি খুব অনুকূল নয়। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী যে এখনও ভারতে আশ্রয় পেয়ে চলেছেন, সেটিও ভারতের প্রতি ঢাকার প্রতিকূল মনোভাবে আরও ইন্ধন যোগাচ্ছে। তার ফলে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক ক্ষমতাগুলি এখনও প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে বিএনপি যা সাধারণত ভারতের আদর্শ বা স্বার্থ, কোনওটির প্রতিই খুব সহমর্মী বলে পরিচিত নয়, সেগুলির সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ তৈরি করা নতুন দিল্লির জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। গদিচ্যুত আওয়ামী নেত্রী, তাঁর দল ও তাঁর তথাকথিত পৃষ্ঠপোষক (ভারত)-এর প্রতি যে সুবিশাল গণ ও রাজনৈতিক আক্রোশ দেখা যাচ্ছে, তা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে, নিজের স্বার্থেই নতুন দিল্লিকে তার এতদিনের হয়/নয় কাঠামোটিকে বাতিল করতে হবে এবং বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মানানসই একটি দ্রুতক্রিয় ও বহুমুখী ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে তাকে। এর মানে এই নয় যে, ঢাকাতে ভারতের পূর্বতন মিত্রদের বা নিজের স্বার্থকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে নতুন দিল্লিকে। বরং, ভারতের দ্বিপাক্ষিক নীতিকে "আওয়ামী-বনাম-বাকি-সবাই" – এই ছাঁচ থেকে বেরতে হবে এবং বাংলাদেশের বর্তমান চাহিদাকে বুঝতে গেলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আরও বৈচিত্রপূর্ণ করতে হবে নতুন দিল্লিকে।

চয়নিকা সাক্সেনা বিগ টেক-এর সংযুক্ত তথ্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা। এই প্রবন্ধের সমস্ত মতামত লেখকের নিজস্ব।